৪

‘মানবাধিকার এমনই মৌলিক প্রকৃতির যে যুদ্ধকালীন সময়েও এটা প্রত্যাহার করা যায় না।’

সারা হোসেন
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

আসক: সারা বিশ্বজুড়েই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জুজু দেখানো হচ্ছে। মানবাধিকারের প্রসঙ্গে যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কথা আমরা এতোদিন জেনে এসেছি, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতো দেশগুলোর পক্ষ থেকে সেগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হচ্ছে। আবার আমরা দেখছি যে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে বা রাষ্ট্রীয় মদদে বিচার-বহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটছে। সরকারগুলোর বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঝুঁকে পড়ার পেছনে ইঙ্গ-মার্কিনিদের চলমান নীতির কোনো প্রভাব আছে কিনা?

সারা হোসেন: এখানে ৯/১১-এর ঘটনাটা না আনলেই নয়, কারণ ৯/১১-এর পরেই আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডগুলো যদিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সব দেশের মিলিত প্রচেষ্টাতেই হয়, তবুও এখানে কোনো কোনো দেশের বেশি প্রভাব থাকে। যেমন আপনি আমেরিকার কথাই বলেন আর ইউরোপের দেশগুলোর কথাই বলেন, তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে এ ব্যাপারে। কিন্তু ৯/১১-এর পরে আমরা দেখেছি এসব দেশের মধ্যেই একটা সাংঘাতিক ভীতি চলে এসেছে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশের মধ্যে মোটামুটি যেগুলোকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই চিনি বা যারা নিজেদের সেভাবেই পরিচয় দেয়, সেই আমেরিকা, ব্রিটেনসহ ইউরোপের অনেক দেশে বিশেষ বিশেষ আইন এর মধ্যে হয়ে গেছে। ওই আইনের মাধ্যমে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে এখনো তারা জাস্টিফাই করছেন না। কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অমান্য করে অনেক ধরনের প্রিভেনটিভ ডিটেনশন বা নিবর্তনমূলক আটককে ব্যাপক মাত্রায় জাস্টিফাই করছেন। তারপর গুয়ান্তানামো বে'র কথা তো আমরা জানি যে, অনেকেই সেখানে আটকে পড়ে আছেন বছরের পর বছর। তাদের কোনো বিচার হচ্ছে না। সেখানে খুব কায়দা করে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে আমেরিকানরা দেখাবার চেষ্টা করছেন যে, তারা আইনের মাঝে থেকেই এগুলো করছেন। কিন্তু বাকি পৃথিবী মনে করছে আসলে তারা আইন ভঙ্গ করছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষমতাসীন যে দেশগুলো আছে, বিশেষ করে আমেরিকা, তারা সবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিচ্ছেন যে, এ রকম আইন লঙ্ঘন করেও পার পাওয়া যায় অথবা আইনের এ ধরনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে অথবা এ ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েও পার পাওয়া যায়। এমনকি এ ধরনের ব্যাখ্যাও দেয়া হচ্ছে যে, আমরা আমাদের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু দরকার, তাই করব। এই ধরনের জাস্টিফিকেশন, এই সুযোগে অন্যান্য দেশও নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে। প্রিএমটিভ মেজার, ইন্টারনাল সিকিউরিটি, টেরোরিজম, কাউন্টার টেরোরিজম– এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের এখন যে রকম কথা বলতে হচ্ছে বা চিন্তা করতে হচ্ছে, ১০ বছর আগে তা আমরা করতাম না। এখন পৃথিবীজুড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। যুগ যুগ ধরে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের যে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডের কথা জেনে এসেছি, এখন সেখানে কথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন করার নামে নানা ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন স্ট্যান্ডার্ড যে রুলগুলো আমরা দেখি ফেয়ার ট্রায়ালের ব্যাপারে, সেখানে অনেক ধরনের বিচ্যুতি, ব্যতিক্রম, ফাঁকফোকর ইত্যাদি ঢোকানো শুরু হয়েছে। আমরা চাই বা না চাই, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি কঠিন বাস্তবতা।

তবে একই সাথে অনেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা মানবাধি-কার নিয়ে কাজ করেন, তারাও এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন। মানবাধিকার সংগঠন গুলো এই বিষয় নিয়ে খুব সিরিয়াসলি কাজ করছে, যেমন– অ্যামনেস্টি ইন্টার-ন্যাশনাল। তারা বিশ্লেষণ করে দেখছেন– আন্ত-র্জাতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের কারণে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে এর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে। তারা সুনির্দিষ্টভাবে যে প্রভাব শনাক্ত করেছেন তা হচ্ছে– অনেক দেশ, যেখানে হয়তো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কোনো ভয়ভীতি নেই, তারাও এখন সন্ত্রাসবাদের নাম করে তাদের দেশের আইন নানাভাবে পরিবর্তন করছে এবং তার প্রভাবে পুরো বিচার কাঠামোটাও পরিবর্তন করে ফেলছে, যাতে করে নিজের দেশের মধ্যে এক ধরনের দমননীতি প্রয়োগ করা যায়। অনেক দেশ শুধু রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্যই এটা করছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে একটু সাইজ করার জন্য এই আইনগুলো তারা ব্যবহার করছে। কিন্তু মুখে বলছে– এগুলো বৃহত্তর স্বার্থে করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে দেশ বা সমাজকে নিরাপদ করার জন্য এগুলো করা হচ্ছে। তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, আন্তর্জাতিক এই পট পরিবর্তনের ফলে র‍্যাবের সূত্রপাত যদি নাও হয়ে থাকে, এই প্রেক্ষাপটটা কিন্তু তাদের গঠন বা কাজকে জায়েজ করার জন্য যথেষ্ট কাজে লেগেছে।

সারা হোসেন
আইনজীবী
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

"মানব আপনি, আমি, এমনকি একজন যুদ্ধাপরাধীও, সেটা আমি পছন্দ করি বা না করি। তো সন্ত্রাসীকে আমরা কেন মানব হিসেবে স্বীকার করব না?"

আসক: আপনার কি মনে হয় র‍্যাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে?

সারা হোসেন: অনেকের মধ্যে এরকম সন্দেহ চলে এসেছে যে, র‍্যাবকে বোধহয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেহেতু র‍্যাব সরকারের অধীনে আছে, সেদিক থেকে এটা তো কোনো ইনডিপেন্ডেন্ট ফোর্স না। আর তাদের তো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। র‍্যাবের ওপর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ যেমন আছে তেমনি আইজিপিরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে। সেইসাথে সেখানে আবার অন্য ফোর্সগুলো থেকে আনা ডিআইজিও থাকে। তো সেক্ষেত্রে এটা আসলে কার নিয়ন্ত্রণে আছে এটা খুব একটা পরিষ্কার না। তার ওপর র‍্যাবের আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে যে, র‍্যাব সরকারের নির্দেশে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্ত চালাবে। তো সেক্ষেত্রে কীভাবে আমরা বলতে পারি যে একদম নির্দলীয় বা নিরপেক্ষভাবে র‍্যাব কাজ করছে?

আসক: এটা তো আইনগত দিক গেল। কিন্তু বাস্তবেও আমরা কিছু কিছু ব্যাপার দেখেছি, যেমন *আহসানউল্লাহ* মাস্টার এমপি হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সুমনের কথা বা অন্যান্য অনেকের কথা বলা যেতে পারে, যারা কোনো দলেরও না বা যাদের সেই অর্থে কোনো সন্ত্রাসী ব্যাকগ্রাউন্ডও নেই। তো এগুলো দেখে আপনার কি মনে হয় যে আসলেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে র‍্যাব ব্যবহৃত হচ্ছে?

সারা হোসেন: আমার মনে হয় এরকমটা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্যদিকে দেখেন, যেখানে শুধু আমরা না সবাই জানে, সরকার জানে, মি. হ্যারি কে টমাস জানেন যে, বাংলাভাই এখনো ঘোরাফেরা করছে, হয় বাংলাদেশের মধ্যেই কোথাও, না হয় সীমান্ত এলাকায়। আর বাংলাভাইয়ের পাশাপাশি আরো তো অনেক জঙ্গি ফোর্স আছে। তাদের বেলায় র‍্যাবের কি কোনো ভূমিকাই থাকবে না? তাদের জন্যই তো আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। আর এমন তো না যে শুধু আপনি-আমি এটা মনে করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজেরাই বলেছেন যে, বাংলাভাইকে ধরা হোক। র‍্যাব কি এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না? র‍্যাব যেহেতু 'এলিট ফোর্স', র‍্যাবের যেহেতু রিসোর্সেস আছে, র‍্যাবের যেহেতু ক্ষমতা আছে এটা করার, তারা কি এধরনের ব্যাপারে কোনো অপারেশন করতে পারে না? এগুলো তদন্ত করার ব্যাপারে তাদের কি কোনো নির্দেশ দেয়া যায় না?

একইভাবে আরেকটি ফোর্সের কথা বলা যায়। আমরা প্রায়ই দেখি খতমে নবুওয়াত আন্দোলন নামে কিছু লোকজন একদম প্রকাশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। শুধু হুমকি না, তাদের মারধর করছে, বাড়ি ভাঙচুর করছে, লুটপাট করছে, মসজিদের ওপর আক্রমণ করছে। শুধু তাই না তারা এগুলো অনেক আগে থেকে সবাইকে জানিয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়ে করছে যে, তারা অমুক দিন, অমুক জায়গায় আহমদিয়াদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারেও তো মনে হচ্ছে র‍্যাবের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ খতমে নবুওয়াতের জন্যও তো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট হচ্ছে।

তবে এটা ছাড়াও র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ভাবনার বিষয় আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার অবশ্যই একটা দিক, কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর তাদের চালানো নির্যাতন নিয়ে আমরা কিন্তু খুব একটা মন্তব্য করছি না। একটা সাধারণ মন্তব্য হচ্ছে যে, যাদেরকে ধরা হচ্ছে তারা তো সন্ত্রাসী এবং আর সবাই তো চায় যে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হলে সন্ত্রাসীদের কোনো না কোনোভাবে মোকাবিলা করতে হবে। হয় এরা গণপিটুনিতে মরবে, না হয় র‍্যাবের হাতে 'ক্রসফায়ারে' মরবে। এই দুইটাই বিচার-বহির্ভূত হত্যা এবং শর্ট টাইমে এটা কিন্তু একটা সমাধান। যেমন, আমরা এখন ভয়ভীতিতে আছি যে, কোনো ভুল করলে, সাথে সাথে র‍্যাব আমাদের ধরবে। তাই আমরা সবাই ঠিক আছি। কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রেও যেমনটা আমরা জানি যে, এই পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ নয়। একটা পরিবারে যখন বাবা সবাইকে পিটাতে থাকে, ওরা ছোট যতদিন থাকে, পিটানির ভয়ে ততদিন তারা ঠিক থাকে। কিন্তু যেই বড় হয়ে যায়, সেই ছেলেটা বা মেয়েটা তখন অন্যদের পিটাতে শুরু করে। তো এখন র‍্যাবকে দিয়ে আমরা এরকম একটা সমাজ সৃষ্টি করে দিচ্ছি, যেখানে আমরা জানি যে, মার খাওয়ার ভয়েই আমরা ঠিক থাকি এবং আমাদের ঠিক থাকার পক্ষে অন্য কোনো কারণ নাই। তাই যখনই আমরা সুযোগ পাব র‍্যাবের হাত থেকে বেরিয়ে আসার, তখন থেকেই কিন্তু আমরা একই পদ্ধতি অন্যদের ওপর চালাতে থাকব। এর অর্থ হচ্ছে যে, আমরা সবসময় ভায়োলেন্সের মধ্যেই থেকে যাব এবং কখনোই সেটা থেকে বের হতে পারব না। এটা ছাড়া তো কোনো শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না। এ থেকে তাৎক্ষণিক একটা প্রতিকার হয়তো আমরা পাচ্ছি; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ফল হিসেবে আমরা বুঝতে পারছি যে, আমাদের সবসময়ই এরকম একটা টেরোরিজম বা রিপ্রেশনের মধ্যেই থাকতে হবে। এছাড়া আমাদের কোনো পথ নাই। যেন আমরা সবাই শিশু বা সবাই অপরাধী– এরকম একটা মনোভাবই এই আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ধরে নেয়া হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এভাবে শাসন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে ঠিক হওয়া কোনোভাবে সম্ভব না। কাউকে কাউকে বিচার ছাড়াই, কোনো প্রশ্ন না তুলেই মেরে ফেলতে হবে।

আসক: কিন্তু আমরা তো জানি যে, অপরাধ বিজ্ঞানের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে এবং শাস্তির ধারণা বা শাস্তির দর্শনে বিভিন্ন পরিবর্তন আসছে...

সারা হোসেন: সেটার তো কোনো প্রতিফলন এর মধ্যে নেই। বরং এই আইন একদম উল্টো। এখন জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেনাল রিফর্ম চলছে। অপরাধীকে কারাগারে পাঠানোর বদলে বিভিন্ন ধরনের বাধ্যতামূলক কমিউনিটি সার্ভিস দেয়ার কথা হচ্ছে, অন্যান্য সংশোধনমূলক শাস্তির কথা হচ্ছে। এদিকে আমরা আরও চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। আমরা কারাগারগুলো কীভাবে মানুষমুক্ত করছি? কমিউনিটি সার্ভিস দেয়ার মাধ্যমে না বরং আমরা তাদের মেরেই ফেলছি। কিন্তু এ ধরনের রিফর্ম তো কোথাও কেউ সুপারিশ করেনি। কিন্তু আমরা যেন সন্ত্রাসীদের চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার জন্য একটা অতি আধুনিক প্রক্রিয়া বের করে ফেলেছি।

আসক: আমাদের সমাজে ন্যায়বিচারের ধারণায় র‍্যাব যেভাবে কাজ করছে তার কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকবে বলে মনে করেন? যেমন ইতোমধ্যেই আমরা দেখছি যে, গণপিটুনিতে মানুষ মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে 'ক্রসফায়ারের' বিষয়টা এখন আর র‍্যাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, পুলিশের কালচারেও তা চলে এসেছে। তো এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হবে?

সারা হোসেন: আমার মনে হয় এখানে আমাদের বাস্তবতাটা স্বীকার করে নেয়া উচিত। বাস্তবতাটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো ধরনের অপরাধের শিকার হই তখন দশবার চিন্তা করি যে আমরা আদালতে যাব কিনা বা বিচার চাইব কিনা। কারণ আমাদের আগেই বিবেচনা

করতে হয় যে, বিচার চাইতে গেলে আমাদের কতো রকমের ঝামেলায় পড়তে হয়। ১০-১৫ বছর কোর্টে যাওয়া, মাসের পর মাস হাজিরা দেয়া, তারপর উল্টো বিভিন্ন রকম হয়রানি-হুমকি ইত্যাদির মুখোমুখি হওয়া। সমাজের সুবিধাভোগী লোকদের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তারা কিন্তু এমনিতেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অনেকেই মনে করছে এর মাধ্যমে তারা কোনো প্রতিকার পাবে না। এর ফলে এই ধরনের একটা মনোভাব আমাদের অনেকের মধ্যে তৈরি হয়েছে যে, না চাইলেও অনেক কিছুই আমাদের মেনে নিতে হবে, কেননা এর বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের যে সিস্টেম তার অর্ধেকটা ইতোমধ্যেই ভেঙেচুরে গেছে। এবং গণপিটুনির মধ্যে আমরা সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন দেখছি। আবার অন্যদিকে আমরা সামারি জাস্টিসের দিকে ঝুঁকছি। হয় আমরা বিচারটা নিজের হাতে তুলে নেব নয়তো পুলিশ বা র‍্যাব নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে এটা করে ফেলুক। অন্তত আমরা একটা সমস্যা থেকে মুক্ত হই। এরকম একটা মনোভাব নিশ্চিতভাবেই আমাদের মধ্যে চলে এসেছে এবং এটার লং টার্ম কেন, মিড টার্ম এফেক্টও মারাত্মক হবে বলে আমার মনে হয়। একটা সমস্যা আসবে এবং সাথে সাথে গুলি করে আমরা সেটা ফয়সালা করে দেব। আমি ওর সাথে কথা বলেও যে মীমাংসা করতে পারি, সেই চিন্তাটা আমার মধ্যে আসবে না। এটার প্রভাব সবক্ষেত্রে পড়বে, শুধু অপরাধের ক্ষেত্রে না। আর এটা তো আমরা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখি– কোনো অহিংস পন্থায় বা ডায়ালগের মাধ্যমে কোনো কিছু সমাধানের চেষ্টা নেই। ফৌজদারি বিচার কাঠামোতেও আমরা তাই দেখি– কোনো নিয়ম-নীতি নাই, কোনো গাইডলাইন নাই। এবং র‍্যাবের মাধ্যমে যে কাজটা করা হচ্ছে, আমার মনে হয় তাতে শুধু ওই সহিংসতা, ওই অসহিষ্ণুতার ধারাই আরো জোরদার হচ্ছে। এটা তো আমাদের জন্য কোনো সুখবর না যে, দুইদিনে আমরা দুই-তিনটা পিচ্চি হান্নানকে মেরে ফেলেছি। এটার কারণে আমার মনে হচ্ছে না কোনো দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক ফল আমাদের সমাজে হবে।

আসক: এই যে মধ্যযুগে ফিরে যাবার প্রবণতাটা আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, তা তো খুব দ্রুত ঘটছে। তো সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে তো আমাদের অনেক সময় লাগবে বলে মনে হয়। অবশ্য যদি ওই ফিরে আসার তাড়নাটা আমরা কখনো ফিরে পাই তবেই।

সারা হোসেন: হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এই পেছনের দিকে যাত্রা করাটা আমাদের জন্য যতটা সহজ, এমনকি বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসাটাও আমাদের জন্য ততটা সহজ হবে না এবং সে ব্যাপারে কারোরই কিন্তু কোনো নজর নাই। এই যে আমরা সবাই র‍্যাব নিয়ে তর্ক-বিতর্কে আটকে আছি– র‍্যাব কারা করেছে, কেন করেছে, র‍্যাব কাদের হয়ে কাজ করছে, কারা এসব কাজের সুবিধাভোগী, রাজনীতিতে এর কী প্রভাব পড়ছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর কী প্রভাব পড়বে সমাজের ওপর, সেটা নিয়ে আমরা কেউ কোনো চিন্তা করছি না, চিন্তা করার চেষ্টাও করছি না। আবার এর কারণে আমাদের সমাজে কিন্তু বৃহত্তর অর্থে একটা নিরাপত্তাহীনতার বোধও তৈরি হচ্ছে। এসব নিয়ে কেন কেউ চিন্তা করছে না– তার একটা কারণ হতে পারে যে, আমাদের অনেকেই মনে করছেন– আমরা আগের চেয়ে নিরাপদ অবস্থায় আছি। যেমন সেদিন একজন ডাক্তার আমাকে বললেন যে, এখন আমি চাঁদাবাজদের কাছ থেকে কোনো কল পাই না, আগে যেমন প্রায় সব ডাক্তারই কালা জাহাঙ্গীর বা অন্যান্য নামে ফোন পেত। এখন অনেকে বলে যে, আমরা খুব নিরাপদ বোধ করি, আমরা রাস্তায় হাঁটতে পারি, সন্ত্রাসীদের মুখোমুখি হতে হয় না। একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার কারণেই মনে হয় লোকজন এভাবে চিন্তা করছে। কারণ আপনি কী করে জানেন যে, আপনি কাল র‍্যাবের সম্মুখীন হবেন না? আপনি হয়তো বলবেন যে, না ওরা তো আমাদের মতো লোক ধরে না। আমি আসলে বুঝি না– তাদের এই বিশ্বাসটা কোত্থেকে আসে। দুইদিন আগে ওয়ার্কার্স পার্টির একজন নেতাকে তারা মেরে ফেলল। একজন বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষ, যার নামে কোনো কেস নাই। *আহসানউল্লাহ* মাস্টার হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী সুমন বা দলিল লেখক মোহাম্মদ আলী। এরকম বেশ কিছু মানুষ যারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করছিলেন, কারও সাথে যাদের কোনো সমস্যা ছিল না, তারা কেবল এ অবস্থাটার শিকার হয়েছেন। তো আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল যে, কীভাবে এই গ্যারান্টি পাওয়া সম্ভব যে কাল এটা আমার-আপনার ক্ষেত্রে হবে না।

আসক: র‍্যাবের কোন দিকটাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করেন?

সারা হোসেন: প্রথম বিপজ্জনক দিক হচ্ছে র‍্যাবের আইনটা। এই অদ্ভুত আইনটাতে আপনি দেখবেন যে, র‍্যাবের কার্যক্রমের কোনো গাইডলাইনস, রুলস, রেগুলেশনস দেয়া নাই। তারা যে শক্তি প্রয়োগ করবে, কোন পরিস্থিতিতে তা করবে, কীভাবে করবে সে সম্পর্কে কিছু বলা নাই। আবার আইনের বাইরে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ করলে কী শাস্তি হবে এগুলো কিছু নাই। সেখানে অনেকগুলো অপরাধের কথা বলা আছে, যেগুলো করলে র‍্যাব সদস্যদের শাস্তি হবে। যেমন বলা হচ্ছে– র‍্যাবের কোনো অফিসার বা সদস্য যদি ধর্ষণ করে তবে স্পেশাল ট্রাইবুনালে তার বিচার হবে। কিন্তু খুন, শারীরিক নির্যাতন, গুরুতর আঘাত ইত্যাদির কথা বলা নেই। অথচ এগুলো দিনের পর দিন হচ্ছে। যেমন আইনের ৯ ধারায় বলা আছে, আর্মড পুলিশের কোনো সদস্য কোনো ঘোড়া অ্যাবিউজ করলে ৩ বছরের কারাদণ্ড হবে। অথচ মানুষ যে মেরে ফেলছে সেটা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নাই। সেটার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বলতে পারি যে, ঠিক আছে এক্ষেত্রে দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি দণ্ডবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধি সেখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। পুলিশ যদি কাউকে মেরে ফেলে তবে আইনে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা আছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট এসে তদন্ত করবেন, পোস্টমর্টেম হবে, এই হবে, সেই হবে। কিন্তু একটা কেসেও কি তা হয়েছে? বা হয়ে থাকলে আমাদের কি সেটা জানানো হয়েছে? মানে জনগণের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা তো তারা জানাক। আমার মনে হয় সবচেয়ে ভয়াবহ দিক যে, তাদের পুরোপুরি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে তো দেয়াই হয়েছে– কেউ তাদের বাধা দেয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এবং কাগজে-কলমেও এই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা কিছুটা অনুমোদন করা হয়েছে। কারণ আইনের মধ্যে তেমন কোনো গাইডলাইন দেয়া নাই। এই যে তাদের কার্যক্রমের জন্য এতোগুলো মানুষ মারা গেছে, অথচ তার জন্য তাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি।

আসক: আপনার কি মনে হয় যে, এই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে র‍্যাবের সদস্যরা চুরি, ছিনতাই, ডাকাতিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে?

সারা হোসেন: একটা সেন্স অব ইমপিউনিটি তো চলেই আসে। আপনি যখন জানতে পারছেন যে, এতোগুলো লোক মারার পরও আপনাকে

কিছুই বলা হলো না, তখন এসব কাজ তো আপনি করবেনই। কারণ স্পষ্টতই আপনি বুঝে ফেলেছেন যে, আপনি আইনের উর্ধ্বে এবং সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের জন্যও আপনাকে জবাবদিহি করতে হয় না। তো সামান্য একটু-আধটু অপরাধ করলে অসুবিধা কী? এই মনোভাব এসে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আসক: সরকারের মন্ত্রীসহ অনেকেই বলেন যে, সন্ত্রাসীদের আবার মানবাধিকার কী? এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী? সন্ত্রাসীদের মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তাটা আসলে কী?

সারা হোসেন: মানবাধিকার শব্দটার ব্যাখ্যা তাহলে দিতে হয়। এর কোথাও কি বলা আছে যে, এটা হলো ভালো মানুষের অধিকার। তাহলে তো আমরা বলতাম যে ভালো মানুষের অধিকার, খারাপ মানুষের অধিকার, এমনকি সন্ত্রাসীর অধিকার। মানব আপনি, আমি, এমনকি একজন যুদ্ধাপরাধীও, সেটা আমি পছন্দ করি বা না করি। তো সন্ত্রাসীকে আমরা কেন মানব হিসেবে স্বীকার করব না?

এটা তো আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় না যে, কে মানব, আর কে না; অথবা কাকে আমরা অধিকার দেব, কাকে দেব না। যে মুহূর্তে আপনি মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করছেন, সে মুহূর্তেই আপনি মানবাধিকার প্রাপ্ত হন। এটা এমনই মৌলিক প্রকৃতির এবং অবিচ্ছেদ্য যে, এমনকি জরুরি অবস্থাতে বা যুদ্ধকালীন সময়েও এটা প্রত্যাহার করা যায় না। অথচ এখন আমরা একটা গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মধ্যে আছি। এই মুহূর্তে আমরা কেন মানুষ মারতে যাব, কোনো কারণ বা অজুহাত ছাড়া।

আসক: আপনি বললেন যে, মানুষ হিসেবে যে জন্মগ্রহণ করে সে ভালো বা খারাপ যে ধরনের মানুষই হোক না কেন তার মানবাধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে বর্তমানে একটা ইন্টারেস্টিং বিতর্ক চলছে বুদ্ধিজীবী মহলে। অনেকেই বলছেন যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন যে ধারণা আমাদের দেয়া হয়, তা আসলে তেমন সর্বজনীন নয়। কেননা এগুলো পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা এবং আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এসব মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। আপনার কী মত?

সারা হোসেন: কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র তো সেকথা বলে না। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকারের বিষয়ে যেসব সনদ বা দলিল আছে, সেগুলো তো আমাদের রাষ্ট্র অনুমোদন করে নিয়েছে এবং বলেছে যে, এগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং আমার মনে হয় না যে, রাষ্ট্র হিসেবে আমরা এসব মানি না বা এটা বলার কোনো অবকাশ আমাদের আছে। আর আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কিছু বলার সুযোগ যার আছে সে হচ্ছে রাষ্ট্র। সমাজও বলতে পারে না, ব্যক্তিও না। তবে আপনি যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রশ্নটা করেছেন তারা হয়তো বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর ইতিহাস, অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরি করা হয়েছে। এই কথাটাও অংশত সত্য, পুরোপুরি সত্য না। কারণ আন্তর্জাতিক আইনের তো অনেক নতুন ব্যাখ্যা হয়েছে এবং এখানে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা বিবর্তনমূলক ব্যাপার আছে। এখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সংযোজন হয়েছে, বিয়োজন হয়েছে। এই সনদগুলো যখন নেয়া হয়েছে ৪০-এর দশকে, ৬০-এর দশকে, এমনকি এই ৯০-এর দশকে– সেখানে অনেক দেশ একত্রে কাজ করে এগুলো তৈরি করেছে। সেখানে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

যেমন মানবাধিকার হিসেবে জীবনের অধিকারের কথা বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে কোনো কারণ ছাড়া বা আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়া খেয়ালখুশিমতো মেরে ফেলা হবে না। কিন্তু জীবনের অধিকারের তো আরেকটা মানেও আছে– কেবল বেঁচে থাকাই একমাত্র কথা না বরং একজন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম চাহিদাগুলো আছে সেগুলো নিশ্চিত করাও এই অধিকারের মধ্যে পড়ে। জীবনের অধিকারের এই যে অন্য দিকটা, সেটা কিন্তু মূলত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকেই বেশি এসেছে। আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলোর ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোই বেশি পুশ করেছে। এমনকি যখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা অন্যরকম ছিল, সোভিয়েত ব্লক, ওয়েস্টার্ন ব্লক আলাদা-আলাদা ছিল, তখনো কিন্তু সোভিয়েত ব্লকগুলো থেকে নতুন নতুন ধারণা পুশ করা হয়েছে। কখনো কিন্তু বলা হয়নি যে, এগুলো আমরা মানব না। বলা হয়েছে যে, এখানে আরেকটা দিক আছে, আর্থ-সামাজিক দিকগুলোকে আমরা আরও গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই। ফলশ্রুতিতে এগুলো যোগ করা হয়েছে। কোনো মৌলিক মানবাধিকার বাতিল করে দিতে কেউ কখনো চায়নি। সুতরাং আমি মনে করি না যে, এই ধারণাগুলো সব ওপর থেকে আরোপ করা হয়েছে। এবং এ ধরনের ব্যাখ্যা যারা দেয় তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দেয় বলে আমার মনে হয়। বুশ যে নীতিতে চলছে এধরনের কথা বলা অনেকটা তার সমতুল্য। বুশ তো পুরো মানবাধিকারকে ভেঙেচুরে দেয়ার তালে আছে। তারাই তো বলছে যে আমরা এটা মানি না, আন্তর্জাতিক আইন আবার কী? আমরা আমেরিকা। আমাদের আইন সব দেশে চলবে এবং সেটা হয়েও যাচ্ছে। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট আমেরিকায় হয়েছে এবং সেটার প্রভাবে আমাদের এখানে আর্মড ফোর্সেস ব্যাটালিয়ন আইনকে নতুন রূপ দিয়ে র‍্যাব চালু করা হলো। তো সেই ক্ষেত্রে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যদি বলি, হ্যাঁ তোমরা যখন মানছ না, তাহলে আমরাও মানব না, তোমরা তোমাদের মতো মানবাধিকারকে ধ্বংস করবে, আমরা আমাদের মতো করবো– তাহলে আন্তর্জাতিক আইন তৈরির আগে যে অবস্থাটা পৃথিবীতে ছিল, আমরা সে জায়গায় চলে যাব। যে যার ওপর ইচ্ছা জুলুম করবে, কারও কিছু বলার থাকবে না– এইরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। যারা এসব যুক্তি দিচ্ছেন তারা কি এটাই চান? এটা অনেকটা সে রকম ব্যাপার, যেটা আগে স্বীকৃত ছিল যে পরিবারের মধ্যে কোনো নির্যাতন হলে এগুলো নিয়ে কথা বলার কোনো দরকার নেই, পরিবারের মধ্যেই সেটা মীমাংসা হবে। তো এনাদের কথা শুনে তো মনে হয় এরকমই যে, আমাদের দেশে একটা সমস্যা হয়েছে, সেটা আমরাই সমাধান করব, কারো কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। আমাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এটা যদি ওরা বলে বলুক, ওদের দেশে অপরাধ হলে আমরা বলব। আমরা তো বলছি না যে আমরা বলব না, যেমন– প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট নিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, গুয়ান্তানামো বে'তে হচ্ছে, ইরাকে হচ্ছে। এসব নিয়ে আমরা বলব। কিন্তু এ মুহূর্তে যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা আমাকে আগে বলতে হবে। বাংলাদেশে র‍্যাবের হাতে নির্যাতিত হয়েছে যারা তারা হয়তো এসে প্রতিকার চাইছে, এই জন্য আমাদের র‍্যাব নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। গুয়ান্তানামোর অজুহাত দিয়ে তো তাদের প্রতিকারবিহীন রাখা যাবে না।

আসক: সরকার ইদানীং ভাবমূর্তি বা ইমেজের প্রশ্নে মাত্রাতিরিক্ত রকম স্পর্শকাতর। বিভিন্ন বিষয়ে সরকার থেকে ভিন্ন মত প্রকাশকারীদের ওপর নানা রকম প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হুমকি আসছে। তো এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে র‍্যাবের মতো একটা 'জনসমর্থনপুষ্ট' বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনারা কোনো বাড়তি চাপের মুখে আছেন কিনা?

সারা হোসেন: আমার মনে হয় না আমরা ব্যক্তিগতভাবে বাড়তি কোনো চাপের মুখে আছি। এবং এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে এর

চাইতে আরও অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে সবাইকে কাজ করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসার আগে আমরা একটা জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়েও গেছি। তখন তো আমরা দেখেছি যে, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সবার পেছনে ঘোরাঘুরি করছে। এবং আমাদের বন্ধুরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করেছেন বা করছেন, তাদেরও এই চাপে থাকতে হয়েছে, মিলিটারির নজরে থাকতে হয়েছে। সেগুলো মোকাবিলা করেই তো তাদের কাজ করতে হয়েছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে এটা তেমন নতুন বা অতিরিক্ত কিছু না। আর যারা এসব ইস্যু নিয়ে কাজ করেন তারা সবাই এই ঝুঁকিটা মেনে নিয়েই কাজ করছেন যে, হ্যাঁ আমাদের ওপর নজর রাখা হবে। তবে এটা ঠিক যে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে গেলে এটা খুব ভালো রকমের একটা বাধা হিসেবে কাজ করে। আমরা না হয় জেনে, শুনে, বুঝেই কাজে নামছি। কিন্তু অন্যদেরকেও তখন ঝুঁকিটা বুঝিয়ে তারপর সংগঠিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে বেশ সমস্যা হয়। আমার মনে হয় সাংবাদিকদের এখনো যথেষ্ট সাহস নিয়ে রিপোর্টিং করতে হচ্ছে। তারা রিপোর্ট না করলে র‍্যাবের অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা হয়তো কিছুই জানতাম না। তো তারাও এই ঝুঁকিটা মাথায় নিয়েই লিখে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে অনেকেই আজকাল বলছেন যে, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর যে রকম ভূমিকা রাখা উচিত ছিল সেটা তারা করছে না। এ বিষয়ে আমি অনেকটা একমত। এর একটা কারণ হতে পারে যে, ইদানীং আমরা দেখছি এনজিওদের সম্পর্কে যে আইন আছে সেগুলো দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুবই অপব্যবহার করা হচ্ছে। সেই আইনগুলো করার আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিদেশি যে টাকাগুলো আসছে, সেটা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা। এইজন্যই মূলত এনজিও বিষয়ক আইনগুলো করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি, এগুলো ব্যবহার হচ্ছে অন্যভাবে। সরকার জিজ্ঞেস করে, আপনারা কেন এটা নিয়ে কাজ করছেন, ওটা নিয়ে কাজ করছেন ইত্যাদি। ইদানীং আমি দেখলাম আমাদের একটা মামলায় সরকার পক্ষ থেকে একজনের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে, তিনি ইসলামবিরোধী কাজ করছেন এবং এইজন্য তার সংগঠনকে এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তো একদম অসৎ উদ্দেশ্যেই আইনগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে আমার মনে হয় এনজিওদের ভয়েসটা অনেকটা সীমাবদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তারা হয়তো ভাবছেন, আমরা যদি এখন র‍্যাব নিয়ে কথা বলতে যাই তাহলে কালই আবার এনজিও ব্যুরো থেকে ফোন আসবে যে, কেন তোমরা এটা করছ, কীভাবে করছ, কোথা থেকে পয়সা আসছে, কোন খাত থেকে খরচ করছো? আমরা তোমার পয়সা আটকে রাখবো। এটা খুবই অ্যাবিউসিভ একটা প্রসেস। কারণ যারা এটা করছে তারা জানে যে, তারা যদি ফান্ড আটকে রাখে তবে সংশ্লিষ্ট এনজিওটি হয়তো আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে চাইবে। তারা হয়তো হাইকোর্টে রিট করবে। তারপর রিটের শুনানি করতে করতে সেই সংগঠনই এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এটা জেনেশুনেই এই কাজগুলো করা হচ্ছে। এটাকে বলা হয় ব্যাড ফেইথ একশন, যেটাকে অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আর কি। আমি জেনেশুনে এমন অবস্থায় একজনকে ফেলে দিলাম যে, সে কখনোই আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পাবে না। পেলেও আইনের প্রতিকার পেতে পেতে সে শেষ হয়ে যাবে। তো ওই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি বলেই সাংগঠনিকভাবে এই ইস্যুগুলোতে আমাদের যতটা কাজ করা দরকার ততটা আমরা করতে পারছি না।

আসক: তবু আমরা দেখছি যে, এনজিও ফরম্যাটে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোই মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অর্গানাইজডভাবে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সিভিল সোসাইটি বলে যাদেরকে আমরা জানি, তাদের কি এই বিষয়গুলোতে সাংগঠনিকভাবে আরও এগিয়ে আসা উচিত নয়? কেননা তাদের তো বাড়তি চাপের মধ্যে থাকতে হচ্ছে না।

সারা হোসেন: অবশ্যই। এখন আমার মনে হয় কি, এই বিষয়টা একদিকে যেমন আমাদের একটা শক্তির উৎস, আবার অন্যদিকে দুর্বলতারও উৎস। কেননা আমাদের দেশে এনজিওরা যতটা সংগঠিত এবং শক্তিশালী, সিভিল সোসাইটি ততটা না। কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। ফলে যেভাবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, আইনজীবীরা, সাংবাদিকরা, পেশাজীবীরা সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, সেটা আমরা দেখছি না। বরং সবসময় দেখছি যে, তাদের বক্তব্যগুলো একপেশে হয়ে যাচ্ছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যখন ৭৮ জন বুদ্ধিজীবী কোনো বক্তব্য রাখলেন তার পরদিন দেখা যায় যে ৯৮ জন বুদ্ধিজীবী মিলে পাল্টা একটা বক্তব্য দেন এবং এদের নাম দেখেই আমরা সকলে বুঝি যে, কে কোন দল ঘেঁষা। তো এই সমস্যাটা এখানে আছে। তবুও আমার মনে হয় কিছু কিছু বিষয়ে আমরা ফ্লোর ক্রসিং করে একত্র হতে পারছি। যেমন– আমরা দেখেছি আহমদিয়া ইস্যুতে অনেকেই, সে এ-ঘেষাঁ হোক আর সে-ঘেঁষা হোক, বলেছেন যে এটা আমরা চলতে দিতে পারি না, এটা আমরা সহ্য করব না, একত্রে দাঁড়িয়ে এটা প্রতিরোধ করব। একইভাবে আমরা আশা করি যে, একত্রে দাঁড়িয়ে সবাই র‍্যাবের বিরুদ্ধে এইরকম একটা প্রতিরোধ করবে।

আসক: যত কমই হোক না কেন র‍্যাবের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরেই কিছুটা প্রতিবাদ তো হয়েছে। আবার আমরা জানি যে, বাইরে থেকেও চাপ আসছে। যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে সম্প্রতি বাংলাদেশ বিষয়ে একটা রেজলুশন পাস করা হয়েছে, যেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল র‍্যাব নিয়ে। তাছাড়া আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে নিয়মমাফিক যে রিপোর্ট করা হয় সেগুলোতেও র‍্যাবের বিচার-বহির্ভূত হত্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার সেগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী বলে মনে করেন?

সারা হোসেন: আমার মনে হয় সরকারের মধ্যেও একটা সেন্স অব ইমপিউনিটি চলে এসেছে– আমরা সবকিছুর উর্ধ্বে, আমাদের যা ইচ্ছা আমরা তাই করব। কেউ আমাদের ধরতে পারবে না, ছুঁতে পারবে না এবং এই ধারণার কিছু ভিত্তিও রয়েছে। কেননা তারা দেখছে সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তাদের আছে পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এবং একটা বিচার ব্যবস্থা– যার একটা স্বাধীন সত্তা থাকার কথা ছিল, সেটার মধ্যেও নানাধরনের রাজনীতিকরণ হয়েছে। সেটার মধ্যেও একটা প্রভাব খাটানো হয়েছে মারাত্মকভাবে, শুধু নিম্ন আদালত না, উচ্চ আদালতেও। তো সেক্ষেত্রে তাদের অনেকের মধ্যেই একটা সেন্স অব ইমপিউনিটি চলে এসেছে যে, তাদেরকে কেউ ধরতে পারবে না। আবার এটা অন্যদিকে আমার মনে হয় তাদের মধ্যে ডু অর ডাই ভাব চলে এসেছে– আমাদের যা করার আমরা করব, আমাদের শক্তিটাকে, আমাদের অবস্থানটাকে আরো জোরদার করব। কারও সমালোচনা গায়ে মাখবো না। তবে এর অন্য একটা দিকও আছে। যখন বাংলাভাইকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত মনে হলো কিছু একশন নেয়া হলো, তখন কেন নেয়া হলো? ইউ.এস.এ. থেকে কম-বেশি নির্দেশ পেয়েই তো তা করা হলো। যদিও আমরা অনেকেই বলব যে, সেটা অনেকটা আইওয়াশের মতো হয়েছে। অনেকেই এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। কিন্তু তারা অন্তত

বাধ্য তো হচ্ছে একটা একশন নিতে। র‍্যাবের ক্ষেত্রেও একদমই যে গা করছে না, তা না। কারণ এখন বলা হচ্ছে যে, হ্যাঁ একটা আইন হবে। এখন বলা হচ্ছে ডিআইজি সরানো হলো, দেখানো হচ্ছে যে কয়েকজন র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে একশন নিচ্ছে। তো খুবই সীমিত পর্যায়ে হলেও তারা কিন্তু কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে।

আসক: আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ইউ.এস.এ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে চাপটা এসেছে সেটার প্রেক্ষিতে বাংলাভাইয়ের ঘটনায় কিছু করা হয়েছে। আবার অন্যদিকে ইউরোপিয়ান কমিশনের পার্লামেন্ট থেকে যে রেজলুশন পাস হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা এগুলোকে ততটা গুরুত্ব দিতে চাই না। তার মানে ইউরোপ আর ইউ.এস.এ-এর চাপের মধ্যে কী মৌলিক বা গুণগত কোনো তফাত আছে ?

সারা হোসেন: অবশ্যই আছে। কারণ ইউ.এস.এ হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার কিন্তু ইউরোপ তো তা না। এবং যেদিন ইউ.এস.থেকে পরিষ্কার একটা মেসেজ আসবে যে, র‍্যাব এইসব উল্টাপাল্টা কী করছে? তোমরা এগুলো ঠিক করো। তখন আমরা দেখব এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আসলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে, যারা বলেন আমরা আন্তর্জাতিক কিছু মানি না, আমরা সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমাদের সিদ্ধান্ত আমরাই নেব; তারা ঠিকই দেখা যায়, ইউ.এস.এ সরকার যখন কিছু বলে তখন মাথা নিচু করে হুজুর হুজুর বলে তা মেনে নেয়। তো একদিকে আমরা বলছি আমরা আন্তর্জাতিক আইন মানি না, এটা পাশ্চাত্যের বিষয়। কিন্তু অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় যে নীতিনির্ধারক, সে একটা নিশ্বাস ফেললে আমি দৌড়ে সব করে ফেলবো– এটা তো মারাত্মক একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ। অথচ এটাই হচ্ছে।

আসক: আমরা দেখেছি এর আগে ক্লিনহার্ট অপারেশনে যৌথ বাহিনী নামিয়ে একই রকম বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। তখন অনেকেই এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করার কথা বলেছিলেন। তো আপনার কি মনে হয় যে, সে সময় এ ধরনের একটি মামলা হলে সরকার র‍্যাব গঠনের আগে একটু চিন্তাভাবনা করতো ?

সারা হোসেন: সে সময় তো একটা মামলা হয়েছিল।

আসক: কিন্তু ওটা তো ছিল হত্যাকাণ্ডের শিকার লিটুর পরিবার থেকে।

সারা হোসেন: না, এটা পুরোপুরি ঠিক নয় যে, কেবল লিটুর পরিবারের উদ্যোগেই মামলাটা হয়েছিল। তার পরিবার মানবাধিকার সংগঠনের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছিল, একজন আইনজীবীও এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। এবং ওই মামলাতে দায়মুক্তির আইনটাকে চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে। তবে একটা বিষয়ে আমি অনেকটা একমত যে, ক্লিনহার্ট অপারেশন নিয়ে সে রকম অর্থপূর্ণ কোনো চ্যালেঞ্জ হয়নি। কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে, কেবল জনস্বার্থ মামলা করেই অর্থপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয় না, নিম্ন আদালতে ফৌজদারি মামলা করেও তা হতে পারে। এখন আপনি দেখেন না, সবচাইতে চাঞ্চল্যকর যে হত্যাকাণ্ড আমাদের ইতিহাসে হয়েছে, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড। সেটা ঘটেছিল জনস্বার্থ মামলা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে। কিন্তু দেখুন, তখন যদি একটা জনস্বার্থ মামলা করা হতো তাতে কি খুব সুবিধা হতো? বরং ট্রায়াল কোর্টে যে মামলাটা করে রাখা হয়েছিল, অনেক পরে যখন পরিস্থিতি কিছুটা ঠিক হয়েছে তখন ওই কেসটা নিয়ে কিছুটা এগুনো গেল। আমাদের নিজেদের একটা অভ্যন্তরীণ সমালোচনা করেই বলি যে, কিছু একটা হলেই আমরা এখন জনস্বার্থ মামলার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সত্যিকার প্রতিকার আসবে নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়া থেকে এবং ওই ব্যাপারে মূল দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের। আর রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয়, যেটা আমরা এখন দেখছি, সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষেও তো মামলা করা সম্ভব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গিয়ে মামলা করতে রাজি না হোক সেখানে তো আপনি-আমি গিয়েই মামলাটা করতে পারি। এই কাজগুলো আমরা ঠিকমতো করছি না। এখন কেউ বলতে পারে যে, নিম্ন আদালতে এই ইনডিভিজুয়াল কেসগুলো করার অবস্থা নেই। কেননা যেই সেটা করতে যাবে, তার ওপর এমন চাপ আসবে, এমন ভয়ভীতি আসবে যে, তার পক্ষে সেটা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলে হাইকোর্টে গিয়ে সেটা বলার সুযোগ তো থাকছেই। সুতরাং এ বিষয়ে সিরিয়াসলি কাজ করা উচিত এবং একটা বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত যে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আগেও যে আমরা ঠিকমতো আইনগত পদক্ষেপ নিতে পেরেছি– তা নয় এবং এখনও পারছি বলে মনে হচ্ছে না। অর্থাৎ আস্তে আস্তে আমরাও ছাড় দিয়েছি এবং তারাও সুবিধাটা নিয়েছে। প্রথম তো আমরা ছাড় দিলাম যৌথ বাহিনীর ক্লিনহার্ট অপারেশনকে, সেটা ছিল সরকারের অনেকটা পাইলট প্রজেক্ট। তারপর ছাড় দিলাম র‍্যাবকে। আর এখন তো র‍্যাবের 'ক্রসফায়ার' মূল ধারায় চলে এসেছে, অর্থাৎ সাধারণ পুলিশ এখন 'ক্রসফায়ারে' মানুষ মারছে। কোনোটা নিয়েই সেই অর্থে কিন্তু আমাদের অর্থপূর্ণ কোনো প্রতিরোধ নেই।

আসক: র‍্যাবের বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রার্থনা কী কী হবে ? র‍্যাবের বিলুপ্তি চাইবেন কিনা?

সারা হোসেন: আমার মনে হয় র‍্যাবের বিরুদ্ধে কয়েকটা জিনিস চাওয়া দরকার। একটা হচ্ছে যে, তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দরকার আছে। আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যারা এ পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে মরেছে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর বেলায় কী তদন্ত হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কী কী আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রে কাকে দায়ী করে মামলা করা হয়েছে এবং সে মামলা এখন কী অবস্থায় আছে– সেগুলো আমাদের জানাতে হবে। এগুলো না হয়ে থাকলে নতুন করে তদন্ত হোক এবং তারপর যারা যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক। তদন্তের জন্য আমরা একটা স্বাধীন কমিশন চাইতে পারি। আপনারা জানেন বোধহয়, সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগ আইন ও সালিশ কেন্দ্রেরই একটা মামলায় এরকম একটা কমিশন গঠনের ব্যাপারে রুলনিশি জারি করেছে। এইরকম নির্দেশ তো ভারতের এবং অন্যান্য দেশের হাইকোর্টে অহরহ হচ্ছে। আর ক্ষতিপূরণ চাওয়া হবে সব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য। অন্ততপক্ষে এই জিনিসগুলো আমাদের চাইতে হবে। এছাড়াও এই রকমের খুন আর যেন না হয় তা চাইতে হবে। এটার জন্য কী কী গাইডলাইন দেয়া যায় এবং এই সম্পূর্ণ 'ক্রসফায়ারের' ব্যাপারটাকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করা উচিত। কেননা আপনি অনবরত এ রকম ঘটনা ঘটিয়ে তা 'ক্রসফায়ার' বলে চালাতে পারেন কিনা– এ ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি।

আসক: মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সারা হোসেন: আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০০৫